গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ৪ - ১০ এপ্রিল ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আসামে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

লাগাতার গ্রাহক আন্দোলনে আসামে ১ এপ্রিল থেকে বিপিএল, গৃহস্থ-এ এবং গৃহস্থ-বি শ্রেণির গ্রাহকদের প্রতি ইউনিটে মাশুল কমাতে বাধ্য হয়েছে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। সংবাদ আটের পাতায়

ভেজাল ওষুধের রমরমা

সরকার দায় এড়াতে পারে না

ভেজাল ওষুধের রমরমা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩০ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

আর জি কর-এর নৃশংস ঘটনা, মেদিনীপুরের স্যালাইন কাণ্ডস্বাস্থ্য ব্যবস্থার চূড়ান্ত দুর্নীতিকে জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হল প্রশাসনের নাকের ডগায় ভেজাল ওষুধের রমরমা ব্যবসা, ওষুধের প্যাকে মেয়াদের তারিখ পাল্টে সেই ওষুধ বাজারে ব্যাপক হারে বিক্রি ইত্যাদি, এই ঘটনাক্রম জনসাধারণের উপর এক নিষ্ঠুর আক্রমণ। জাল ওষুধের উৎপাদন অন্য রাজ্যে হচ্ছে বা সেখান থেকে সব আসছে—এই কথার দ্বারা রাজ্য সরকার, তার স্বাস্থ্যদপ্তর এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর দায় এড়াতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া

আটের পাতায় দেখুন

বিজেপির রামনবমী পালনে ভোটটাই মুখ্য

আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রামনবমী পালনকে রীতিমতো একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত করে ফেলেছেন বিজেপি-নেতারা। কিছু দিন ধরে তাঁরা থেকে থেকেই ঘোষণা করছেন ওই দিন তাঁরা কতগুলি মিছিল করবেন, কত বিরাট সংখ্যায় মানুষ এই মিছিলগুলিতে যোগ দেবেন ইত্যাদি। অবশ্য মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের তাঁরা মানুষ হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন একেবারে 'হিন্দু' ভোটার হিসাবে। তাই তাঁরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছেন কত 'হিন্দু' তাঁদের মিছিলে যোগ দেবেন।

দলীয় প্রভাব বাড়াতেই রামনবমীর হুজুগ

কয়েক বছর আগেও এ রাজ্যে রামনবমী নিয়ে মানুষের মধ্যে বিশেষ কোনও উন্মাদনা ছিল না। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কেউ কেউ নিজেদের ইচ্ছামতো দিনটি পালন করতেন। এই নিয়ে বিশেষ সমারোহ বাংলার উৎসবের তালিকায় নেই। তাই রাজ্যে রামমন্দিরের সংখ্যাও দীর্ঘকাল ধরে হাতে গোনা। তা হলে হঠাৎ কী এমন ঘটল যে সেই পশ্চিমবাংলায় রামনবমী পালনের হিড়িক পড়ে গেল?

বাস্তবে এই হিড়িক সাধারণ মানুষের নয়। বিজেপি নেতারা স্রেফ ভোটের স্বার্থে এই হিড়িক বানিয়ে তুলছেন। গত শতকের আটের দশকের শেষ থেকে বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্ককে খুঁচিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে যে রাম-রাজনীতি বিজেপি শুরু করে তারই অনুষঙ্গ এই রামনবমী পালন। তার প্রভাব উত্তর ভারতে কিছুটা পড়লেও এ রাজ্যে তেমন পড়েনি। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসার পরই বিজেপি এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে দলীয় প্রভাব বাড়াতে রামনবমী পালনকে অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

ধর্মাচরণ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। ধর্মাচরণের আনুষঙ্গিক রীতি পালনেও কোনও বাধা নেই। কিন্তু সেই রীতি পালন যখন রাজনৈতিক মদতে সমাজ জুড়ে বিশৃঙ্খলা, অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত হয় তখনই তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দুর্গাপুজো বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষের অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র থাকে না। কারণ ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের অন্য কোনও লুকানো উদ্দেশ্য তার মধ্যে কাজ করে না। একই রকম ভাবে মহরমের মিছিলও দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। কখনও কারও কাছে তা আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠেনি। অথচ বিজেপি-আরএসএস আয়োজিত রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েক বছরে উপর্যুপরি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ মানুষের মনে

সাতের পাতায় দেখুন

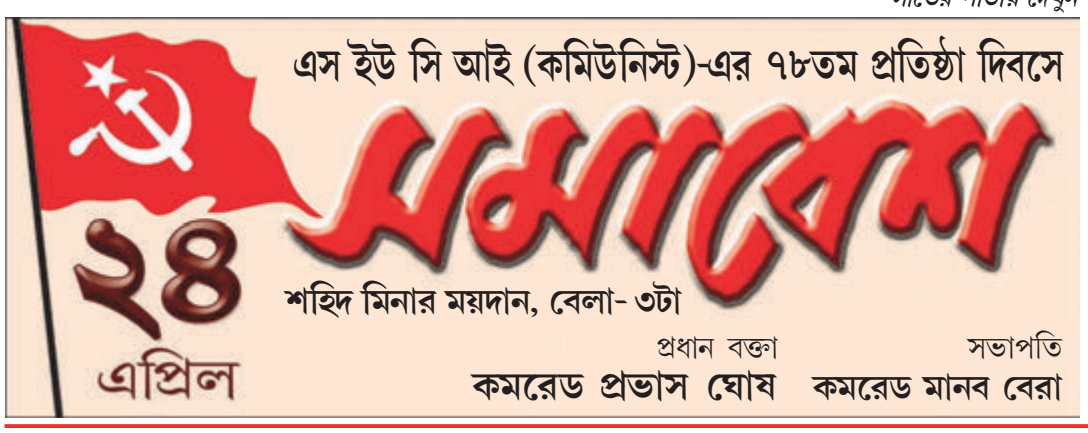

জনগণকে চরম দুর্দশায় রেখে নিজেদের মাইনে বাড়িয়ে নিলেন সাংসদরা

বাজারদরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাকি চলতে পারছেন না সাংসদরা! চাল-ডাল-সবজির আগুন-ছ্যাঁকা দামে নাকি নাজেহাল হচ্ছেন তাঁরা! সে জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাঁদের বেতন এক লাফে ২৪ হাজার টাকা বাড়িয়ে করল ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এ ছাড়া নির্বাচনী এলাকা ভাতা হিসাবে মাসে ৮৭ হাজার টাকা, অফিস খরচ বাবদ মাসে ৭৫ হাজার টাকা মিলিয়ে তাঁরা প্রত্যেকে প্রতি মাসে পাবেন প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। এর সাথে অন্যান্য সুবিধা বাবদ প্রাপ্ত অর্থও বাড়ানো হয়েছে অনেকটা। প্রাক্তন সাংসদদেরও পেনশন মাসে ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১ হাজার টাকা। এই বৃদ্ধি আবার কার্যকর হবে ২০২৩-এর ১ এপ্রিল থেকে। অর্থাৎ দু-বছরের বাড়তি টাকা পাবেন তাঁরা। এই বৃদ্ধিকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম সহ সব শাসক দল এবং তাদের সাংসদরা। ভাতা-বৃদ্ধি অনৈতিক এবং অন্যায্য বলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন ওঠে, সাধারণ মানুষ যখন বাজারে গিয়ে চড়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল হচ্ছেন, অসুস্থদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধটুকুও কিনতে পারছেন না, কৃষক যখন ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, শ্রমিক যখন কারখানা বন্ধ হওয়ায় সন্তানের স্কুলের মাইনে দিতে না পেরে পড়া বন্ধ করে দিচ্ছেন, তখন সরকারের ভূমিকা কী? সাংসদদেরই বা ভূমিকা কী? তাঁরা কি সেই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি তোলেন? সরকার কি একই রকম ভাবে সাধারণ মানুষের দাবি মেনে দাম কমিয়ে দেয়, কাজের ব্যবস্থা করে, ফসলের দাম পেতে সাহায্য করে, ফি মকুব করে? উল্টে তাঁরা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য সবক্ষেত্রেই বরাদ্দ ছাঁটাই করছে। তা হলে সরকার কি 'দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি' দেখতে পাচ্ছে কেবল যথেষ্ট সচ্ছল সাংসদদের মধ্যেই? উল্লেখ্য, দেশের ৯৩ শতাংশ সাংসদই বহু কোটি টাকার মালিক। অথচ তাঁদের দুঃখে সরকার-মন্ত্রীদের চোখে জল আসছে! আরও আশ্চর্যের বিষয়, আশাকর্মী-মিড ডে মিল কর্মীদের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও তাঁদের ন্যায্য বেতন দিতে সরকার যখন টালবাহানা করে চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে, তখন সেই সরকারেরই সাংসদদের বেতন দৃষ্টিকটু ভাবে বাড়াতে এতটুকু চক্ষুলজ্জাতেও বাধল না! এই সরকার যে আসলে কাদের, বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

সাংসদরা হলেন জনপ্রতিনিধি। এটি কোনও চাকরি নয়, স্বেচ্ছামূলক কাজ। ভোটে জিতে জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধা দেখা তাঁদের কর্তব্য। কিন্তু সাধারণ

দুয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড সদানন্দ বাগলের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পূর্বতন প্রবীণ সদস্য, শিক্ষক তথা গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড সদানন্দ বাগল ২২ মার্চ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘ দিন তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

কমরেড সদানন্দ বাগল ১৯৪৮-এ ছোটবেলাতেই পরিবারের সাথে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দলে একটি শ্রমিক মহল্লায় থাকতেন। পরে শ্যামনগরের শরৎ পল্লিতে তাঁরা চলে আসেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন চটকল শ্রমিক। ছোটবেলা থেকেই তিনি ডানপিটে এবং আমুদে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই বামপন্থার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্যতম রূপকার মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুসংবাদ কীভাবে জগদ্দল এলাকার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গভীর শোকের জন্ম দিয়েছিল, সমস্ত জুটমিল বন্ধ করে শ্রমিকরা দলে দলে খালি পায়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, চোখের জলে স্ট্যালিনকে স্মরণ করেছিলেন— সে ঘটনা তিনি বারবার বলতেন।

১৯৫৩-তে তিনি 'এসইউসি স্টুডেন্ট বুরো'র সঙ্গে যুক্ত হন। এ বিষয়ে তাঁর শিক্ষক কাঁকিনাড়ার মাদ্রাল অঞ্চলের কমরেড রতন ভৌমিকের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪-তে এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে তিনি একজন প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন ও কমিটিতে নির্বাচিত হন। সেই সময় কংগ্রেস ও অবিভক্ত সিপিআইয়ের বিপুল দাপটের সামনে এসইউসিআই(সি)-র রাজনীতি করাটা ছিল খুবই কঠিন। দরিদ্র পরিবারেও ছিল নানা বাধা। কিন্তু কমরেড সদানন্দ বাগল সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে থাকেন। সংগঠনের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং কিছুদিন পর ভাটপাড়া অফিসেই থাকতে শুরু করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই অফিসে এক সময় গেছেন। পরে কলেজে ভর্তি হয়ে নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে এআইডিএসও-র প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন কমরেড সদানন্দ বাগল। এই সময় তিনি প্রয়াত কমরেড তাপস দত্ত (পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য), কমরেড সনৎ দত্ত এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে কাজ করতে থাকেন। ষাটের দশকে গুটিকয়েক কর্মীকে নিয়ে তাঁর পৈতৃক বাড়িতেই শ্যামনগর পার্টি ইউনিট গঠন করেন। শ্যামনগরের বর্তমান পার্টি অফিস তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল।

কমরেড সদানন্দ বাগল স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষক হলেও দলের কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে দেন। শিক্ষক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল নেতৃত্বকারী। ১৯৭০-এর দশকে সিপিএমের সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষককে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (এসটিইএ) গড়ে তোলার উদ্যোগে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। শিক্ষক আন্দোলনে তিনি রাজ্যস্তরে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। সিপিএম সরকারের প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক আন্দোলনে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

দলের রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায় নরেন্দ্রপুরে কলেজ পড়া শেষ করে শ্যামনগরে ফিরে আসার পর কমরেড সদানন্দ বাগলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এআইডিএসও এবং দলের কাজ শুরু করেন। কমরেড দীপঙ্কর রায়ের যোগাযোগে থাকা দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করে শ্যামনগরে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় ও লাইব্রেরি গড়ে তোলার কাজে কমরেড সদানন্দ বাগলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে রাজ্যে দৃষ্টিহীনদের সংগঠন ও তাদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনে কমরেড সদানন্দ বাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। শ্যামনগরের প্রতিষ্ঠান ও পরবর্তীকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মল্লিকপুরে ব্রেল প্রেস ও দৃষ্টিহীনদের সংগঠনের কাজেও তিনি ভূমিকা নেন। জগদ্দল, নৈহাটি এলাকার জুটমিলে শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজেও তাঁর উদ্যোগ ছিল। '৭৪-এর রেল ধর্মঘটেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। খাদ্য আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হয়ে বেশ কয়েক দিন জেলও খেটেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের সংগঠনের কাজেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করেছেন। ১৯৮৭-তে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক এবং ওই বছরই তমলুকে দলের রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

শ্যামনগরে তাঁর বাসস্থান এলাকায় ক্লাব, সামাজিক সংগঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁরই উদ্যোগে গঠিত নাগরিক কমিটি সিইএসসি-র শ্যামনগর পাওয়ার হাউসের ছাইয়ের দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। শ্যামনগর-ভাটপাড়া অঞ্চলে নাগরিক কমিটির মাধ্যমে জলকর বিরোধী আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। রাজ্য স্তরে মানবাধিকার আন্দোলন, পরিবহণ যাত্রী কমিটির আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন।

তিনি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক থাকাকালীন এবং পরবর্তী সময়েও দলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন। কমরেডদের, এমনকি অন্য দলের সমর্থক বহু মানুষের বাড়িতে যাওয়া ও তাদের সাথে মেশা তাঁর অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। কথায় রসসৃষ্টির যে শৈলী তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তার দ্বারা তিনি যে কোনও মানুষকে উদ্দীপিত করতে পারতেন।

তাঁর চরিত্রের একটা বড় দিক হল, তাঁর থেকে বয়সে ছোট কেউ নেতৃত্বে এলেও তাঁকে মেনে অনায়াসে কাজ করতে পারতেন। জেলা বা রাজ্য স্তরে কাজ করলেও লোকালের সমস্ত কর্মসূচিতে তিনি নিজে সবসময় কিছু দায়িত্ব পালন করতেন। এক সময় জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেও অসুস্থ অবস্থায় যখন ঠিক মতো চলাফেরা করতে পারছেন না, তখনও তিনি লোকাল সম্পাদক বা জেলা সম্পাদকের সঙ্গে কথা না বলে কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন না। রাজনৈতিক চর্চার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সর্বদাই। যখন নিজে পড়তে পারতেন না, অন্যদের বলতেন দলের বইপত্র, কাগজ পড়ে শোনাতে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কমরেড সদানন্দ বাগল নিজেকে বিপ্লবী হিসেবে রক্ষা করার নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

কমরেড সদানন্দ বাগল লাল সেলাম

মাইনে বাড়িয়ে নিলেন সাংসদরা

একের পাতার পর

মানুষের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও পূরণে কী ভূমিকা তাঁরা নিচ্ছেন? মূল্যবৃদ্ধি কমাতে, কাজের সুযোগ তৈরিতে, ফসলের ন্যায্য দাম পেতে কিংবা কারখানা খুলতে সাংসদদের সংসদে দাঁড়িয়ে সওয়াল করতে দেখা যাচ্ছে কি? উল্টে কোনও ভোটাভুটি ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে সংসদে পাশ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক জনবিরোধী বিল। সাংসদরা ব্যস্ত থাকছে কখনও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে, কখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে চিৎকার চেঁচামেচিতেই। এই হল পবিত্র 'সংসদীয় গণতন্ত্র'! এ ভাবেই ইতিমধ্যে সংসদে পাশ হয়ে গিয়েছে শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি। পাশ হয়েছে কৃষক স্বার্থবিরোধী নয়া কৃষিনীতি। চালু হয়েছে গ্রাহক স্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন, সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি। এই সব ক'টিতেই সাধারণ মানুষের স্বার্থ চূড়ান্ত বিপন্ন হচ্ছে, লাভবান হচ্ছে কর্পোরেট মালিকরা। সরকারে বসে এই আইনগুলির মাধ্যমে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্পোরেটদের আরও মুনাফা লোটার বৈধ ছাড়পত্র দিচ্ছে মন্ত্রী-সাংসদরা। সর্বোচ্চ মুনাফার উপর দাঁড়িয়ে আছে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তার সেবা করে যে সব দল, তাদের সাংসদরা কি জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারেন? পারেন না বলেই প্রতিটি অধিবেশনে একের পর এক জনবিরোধী বিল সহজেই পাশ হয়ে যায়। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দাবি নিয়ে সংসদ অচল হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের স্বার্থ বলি দিয়ে তাদের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা প্রকাশ করছেন এই জনপ্রতিনিধিরা? জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি তারাই, যারা এই সমাজের মধ্যেও তাদের স্বার্থরক্ষায় বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়াতে পারেন। সংগ্রামী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ-বিধায়করা তাঁদের এমন ভূমিকা বারেবারেই প্রমাণ করেছেন। ২০০৯-১৪ এই সময়কালে সংসদে ভাতাবৃদ্ধির একমাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। তিনি বলেছিলেন, যাদের ভোটে সাংসদরা নির্বাচিত হন, তাদের চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে ফেলে রেখে নিজেদের বেতন-বৃদ্ধির দাবি চূড়ান্ত অনৈতিক। সাংসদরা খেয়ে-পরে-গাড়ি চড়ে জীবন নির্বাহ করার মতো যথেষ্ট বেতন পান, অন্যান্য অনেক সুবিধাও পান। বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোন, ইন্টারনেট চার্জ বাবদ যথেষ্ট টাকা পান। সে জন্য সাংসদদের ভাতা-বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সেই টাকায় তাঁর সংসদীয় এলাকা জয়নগরে সাধারণ মানুষের বিনামূল্যে শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নীতি-আদর্শহীন দলগুলির নীতিহীন আচরণের বিরুদ্ধে এটা আজও দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

দেশে ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে যেখানে ৯৩ শতাংশ কোটিপতি, সম্পদের পাহাড় চূড়ায় বসে তাঁদের কি একবারও মনে পড়ে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১০৫তম, শিশু-অপুষ্টিতে প্রথম স্থানে, মহিলা-অপুষ্টিতে সামনের সারিতে? খর্বাকার-শীর্ণ শিশুর দল কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে দুটো ভাতের আশায় মিড ডে মিলের জন্য যখন স্কুলে ছোটে, তখন নিজেদের বেতন আরও বাড়িয়ে নেওয়ার আগে কি তাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কথা এই সাংসদদের একবারও মনে পড়ে না? যে সরকার মিড ডে মিলে কখনও ১৩ পয়সা বাড়িয়ে 'দাতা' সাজছেন, যে প্রধানমন্ত্রী এই হতভাগ্য শিশুদের 'মেদবৃদ্ধিতে' আশঙ্কিত হয়ে তেলের বরাদ্দ ১০ গ্রামেরও কম করার হাস্যকর নিদান দিচ্ছেন, তাঁরাই কেমন অনায়াসে সাংসদদের মাইনে বাড়িয়ে যাচ্ছেন।

বাস্তবে এই সব দলগুলি এবং তাদের সাংসদরা সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন। তাই তাদের দুঃখ-কষ্ট, খিদে-অসুস্থতা, অশিক্ষা এই জনপ্রতিনিধিদের মনে এতটুকুও দাগ কাটে না। যদি কাটত তবে তাদের বঞ্চিত রেখে নিজেদের মাইনে বাড়ানোর মতো এত বড় অনৈতিক কাজ তাঁরা করতে পারতেন না।

সাংসদদের বেতন ও সুবিধা

ক্ষেত্র	আগে ছিল	বর্তমানে হল
মাসিক বেতন	১,০০,০০০	১,২৪,০০০
" এলাকা ভাতা	৭০,০০০	৮৭,০০০
" অফিস খরচ	৬০,০০০	৭৫,০০০
দৈনিক হাজিরা ভাতা	২,০০০	২,৫০০
আসবাব (এককালীন)	১,০০,০০০	১,২৫,০০০
পেনশন	২৫,০০০	৩১,০০০

এ ছাড়া বছরে ৩৪ বার আন্তঃবিমান ও ট্রেনে প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ, স্বাস্থ্যসেবা, টেলিফোন (১ লক্ষ ৫০ হাজার), বাড়ি ও অফিসের ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ (৫০ হাজার ইউনিট) জল (৪ হাজার কিলোলিটার) ফ্রি

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

প্রকৃত মর্যাদা কাকে বলে

"কেউ ভাবতে পারে, আমি একটু লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হব, এটা হল অনারেবল ওয়ে (সম্মানজনক)। কিন্তু ডাক্তার হলেও তো হবে না। কারণ এই সমাজে ডাক্তার যদি এথিক্স অফ মেডিকেল সায়েন্স-কে আপহোল্ড করে (নিয়ে চলে), ডাক্তারের নোবল লাইফ লিড করতে (মহৎ জীবন নিয়ে চলতে) চায়, তা হলে হয়ত কখনও কখনও তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। তার দ্বারা হয়ত প্র্যাক্টিসও তেমন হবে না এবং সে নামও করতে পারবে না এবং টাকাপয়সাও তার হবে না। কেউ হয়ত তাকে ব্যাক (মদত) করবে না। সে একটা পাগল বলে গণ্য হবে। সর্বস্তরে তার রীতিনীতি, নৈতিকতা, মেডিকেল এথিক্স নিয়ে সংঘর্ষ হবে। ফলে সে কিছুই করতে পারবে না। তা হলে মেডিকেল এথিক্স বা বিজ্ঞানের যে এথিক্স, একজন বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার বা কেমিস্ট হোক বা ফিজিক্সের ছাত্র হোক, তার কোনও কিছু পরোয়া না করে, হোয়াট ইজ দ্য এথিক্স অফ সায়েন্স— তার পরোয়া না করে তিনি যদি নিজেকে গোলাম, চাকুরিজীবীতে পর্যবসিত করেন, পয়সার বিনিময়ে টাটার কাছে, না হয় বিড়লার কাছে, না হয় কোনও ফার্মের কাছে, না হয় গভর্নমেন্টের কাছে, নিজের বিবেক বিক্রি করেন, হ্যাঁ তা হলে তার পয়সা হবে, নাম হবে। এই তো? কিন্তু সে যদি ভাবে যে না না, আমি তো ওয়াগন ব্রেক করে বা রেস খেলে বা গুন্ডাদল তৈরি করে টাকা করে তো নাম করিনি, আমি ডাক্তারি করে নাম করেছি, ফাঁকি দিয়ে নয়। কিন্তু তুমি কি জানো যে শুধু ডাক্তারি করে তুমি নাম করোনি। ডাক্তারির সঙ্গে তুমি গোলামি করেছ, তোষামোদি করেছ। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে গোলামি করেছ, তোষামোদি করেছ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছ। মানব সভ্যতার চরম দুশমনদের কুকার্যগুলোকে চুপ করে থেকে হজম করেছ। তাদের কাছে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিকিয়ে দিয়েছ। তবে তুমি পয়সা করেছ। এর নাম কি মর্যাদা? এই মর্যাদার জন্য সিদ্ধার্থবাবুর দল দৌড়চ্ছে, অন্য দলগুলো দৌড়চ্ছে। পৃথিবীতে দু'দল মানুষ আছে। একদল মানুষ ঠুনকো মর্যাদার জন্য দৌড়তে থাকে। আর এক দল মর্যাদা বলতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস মনে করে। মনে করে বিবেকের দংশন কী করতে বলে, মনে করে সত্যিকারের প্রগতি আছে সেখানেই যেখানে সমাজের অগ্রগতি নিহিত রয়েছে, যে অগ্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষকে তার কূপমণ্ডুকতা, দুর্বলতা, লোভ, ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করা এবং সেই রাস্তায় মাথা উঁচু করে সংগ্রাম করা। সমাজকে শোষণমূলক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া, অবিরাম সমাজের পরিবর্তন আনা। আর সমাজের এই পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং তার বিকাশের রাস্তা খুলে দেওয়া।

আজ সমাজের সমস্ত পরিবেশটা হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমি তো একটা মানুষ বা সোসাল বিইং! আমি সচেতন শুভবুদ্ধি নিয়ে ঘরে বাইরে, সমাজে, চাকরির ক্ষেত্রে, সর্বত্র এই যে বিরুদ্ধ পরিবেশ তাতে আমি ঠিক থাকতে পারি না। কারণ, এই সমাজের উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আমাকে বাঁচতে হবে। আর এই বাঁচার দুটো রাস্তা আছে। একটা হল এই অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, প্রতিবাদ করা, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে না খেয়ে মরলেও মাথা উঁচু করে চলা। আর না হয়, লেখাপড়া শিখে শিক্ষার অভিমান নিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলামি করা, মাথাটাকে বিকিয়ে দেওয়া। এই উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যায় ব্যবস্থার সাথে এই যুক্তি সেই যুক্তি খাড়া করে গোলামির পক্ষে ওকালতি করা। অন্য দিকে এই পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে এগোতে শুরু করল সে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তু গ্রহণ করতে শিখবে। তার কিছু চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

আর একটা বিষয়ও বুঝতে হবে। এই সমাজে স্নেহ-মমতার বন্ধন কি শুধু পরিবারের মধ্যেই রয়েছে? জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিডম কথাটার যথার্থ মানে বুঝলে সে বুঝতো, কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে রয়েছে আমার হৃদয়ের কারবার। ঘরের পাঁচজন লোক চোখের জল ফেলবে বলে সত্য পথে আমি পা বাড়াতে পারলাম না— এর নাম কি স্নেহ-মমতাকে স্বীকার করলাম? না। স্নেহ-মমতা আর দুর্বলতা এক জিনিস নয়। স্নেহ-মমতা তো মানুষকে দুর্বল হতে বলে না। কাপুরুষতা মানুষকে দুর্বল হতে বলে। স্নেহ-মমতার সাথে কোনও বিরোধ নেই বিপ্লবের। কিন্তু স্নেহ-মমতা আমাকে দুর্বল হতে বললে আমি দুর্বল হব কেন? মমতা আছে বলে আমি দুর্বল হব কেন? মমতা আছে বলে আমি বিবেক ছাড়ব কেন? মমতা আছে বলে আমি সত্য পথ পরিত্যাগ করব কেন? এইগুলো যার গোলমাল হয় না, তার তো এ রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে আসতে পারে না। আর এই ধরনের প্রশ্নে গোলমাল বা হবে কেন? গোলমাল হয় তার, যে এ সব প্রশ্ন ভাল করে বোঝে না, পরিষ্কার করে বোঝে না। নতুন নতুন কর্মীরা এ সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করল— কোথায় যাব, কোথায় থাকব? তার মানে কী? সে এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থাকার জায়গা দেখতে পায় না। তার মানে দে হ্যাভ নট লার্নড টু ওয়ার্ক উইথ দ্য মাসেস (তারা জনগণের সঙ্গে থেকে কাজ করতে শেখেনি)। সেইজন্যই বলছি যে, জ্ঞান ক্রিয়াধর্মী হয় তখন, যখন ফ্রিডম সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান আমাকে প্রথমেই জনসাধারণকে সংগঠিত করার মধ্যে নিয়ে যায়, পার্টি সংগঠন গড়ার মধ্যে নিয়ে যায়। আই লিভ ইন দ্য পার্টি, আই লিভ উইথ দ্য মাসেস, অ্যামং দ্য মাসেস (আমি দলের মধ্যে থাকি, জনগণের সঙ্গে থাকি, জনগণের মাঝে থাকি)। এ জায়গায় আমার বিরোধ হচ্ছে না। খাওয়া, না-খাওয়া, চলা-বসা, দুঃখ-কষ্ট সবই এ ভাবে ভাবতে শিখি। ফলে একদল এক সম্পর্ক ভেঙে আর এক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরিবারের পাঁচটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গিয়েছে, পাঁচশো লোকের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তা আরও গভীর, আরও মমতায় ভরপুর, আরও রসপূর্ণ। এই তো বিপ্লবীর জীবন। যে এটা বোঝে তার তো এ সব প্রশ্ন ওঠার জায়গাই নেই।"

বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়ঃ
শিবদাস ঘোষ

ব্যাঙ্ক শিল্পের প্রত্যাহৃত ধর্মঘট ও কিছু প্রশ্ন

২৪-২৫ মার্চের পূর্বঘোষিত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হল। ব্যাঙ্কশিল্পে পর্যাপ্ত নিয়োগ, সপ্তাহে সর্বাধিক ৫ দিন ব্যাঙ্ক খুলে রাখা, কর্মক্ষমতা অনুযায়ী উৎসাহ-ভাতা (পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেন্টিভ বা পিএলআই) না দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে দেশ জুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ব্যাঙ্কের অফিসার এবং কর্মচারীদের ৯টি ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ ইউএফবিইউ (ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণ না করা, কাজের দৈনিক সময় কমিয়ে প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করা, চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের নিয়মিতকরণ, 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' কার্যক্রম বাতিল, সমকাজে সমবেতন নীতি চালু, শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিস) নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল, অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) উদ্ধারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, পেনশন আপডেশন, এনপিএস, ইউপিএস-এর পরিবর্তে পুরানো পেনশন স্কিম ফিরিয়ে আনা, সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে সাধারণ গ্রাহকদের পকেট না কাটার মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবিকে যুক্ত করে এই ধর্মঘটকে বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছিল অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (এআইবিইইউএফ)।

ইউএফবিইউ-এর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় শ্রম কমিশনারের উপস্থিতিতে সরকারি (ডিএফএস) এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ) প্রতিনিধিদের আশ্বাসের ভিত্তিতে তারা এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। এআইবিইইউএফ-এর মতে, ব্যাঙ্ক শিল্পের মূল সমস্যার বাইরে গিয়ে কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে এ ভাবে ধর্মঘট তুলে নেওয়া ব্যাঙ্ককর্মী সহ সচেতন ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি এক চরম আঘাত।

ধর্মঘটের দাবিগুলিকে বিচার করে দেখা যাক। মুখ্য দাবি ছিল, অবিলম্বে সমস্ত ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে হবে। দিনে দিনে ব্যাঙ্কগুলিতে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে অবাধে। তাও করা হচ্ছে সম কাজে সম বেতনের নীতি লঙ্ঘন করে। চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা দুর্নীতির শিকার হচ্ছেন অসহায় কর্মীরা। এঁদের চাকরির নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। যখন তখন অবাধে নেমে আসে ছাঁটাইয়ের খড়্গ। তাই সঠিক ভাবেই দাবি উঠেছে, কোনও শিক্ষানবিশ নিয়োগ নয়, চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মীদের উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে স্থায়ী কর্মীতে পরিণত করতে হবে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের দাবি— সপ্তাহে সর্বাধিক ৫ দিন ব্যাঙ্ক খুলতে হবে। কর্তৃপক্ষ বহু বার আশ্বাস দিলেও এখনও তা মেনে নেয়নি। দৈনিক কাজের সময় ৬ ঘণ্টা করারও দাবি উঠেছে। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল শুধু ব্যাঙ্কের মুনাফা বাড়ানোয় ব্যবহৃত হবে, শ্রমিক শ্রেণি তার সুফল পাবে না, তা হতে পারে না।

দাবি উঠেছে কর্মক্ষমতা অনুযায়ী উৎসাহ-ভাতা (পিএলআই) দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এখানে কর্মক্ষমতা বা সম্পাদিত কর্মের পরিমাণ নির্ধারিত হবে কর্তৃপক্ষের বিচার অনুসারে, যা পক্ষপাতদুষ্ট হতে এবং পরিণামে কর্মচারীদের ঐক্য নষ্ট করতে বাধ্য।

এ সব কিছুই হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে। সেই উদ্দেশ্যেই সংযুক্তিকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭ থেকে ১২টিতে নেমে এসেছে। সরকার এই সংখ্যা আরও কমাতে চায়। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জনসাধারণের সমূহ অর্থের নিয়ন্ত্রক করতে চাওয়া হচ্ছে এ দেশের ধনকুবেরদের। বলা বাহুল্য, এই ধনকুবেররাই বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে শোধ না করায় ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) বাড়ছে। ব্যাঙ্কগুলোর এই ক্ষতি সামাল দিতেই কর্মী সংকোচন, ব্যাঙ্কের আমানতের উপর সুদের হার কমানো, সাধারণ মানুষের ঋণের উপর সুদের হার বাড়ানো এবং গ্রাহক পরিষেবা ক্ষেত্রকে অযথা বড় করে দেখিয়ে সেখান থেকে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে পরিষেবা শুল্ক (সার্ভিস চার্জ) আদায় করা হচ্ছে। এনপিএ উদ্ধারে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে কিংবা ইচ্ছাকৃত ঋণ-খেলাপিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিয়ে সরকারের নির্দেশে এই বিপুল পরিমাণ ঋণ খাতা থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। এরপর এই সব ধনকুবেররা ব্যাঙ্কের মালিকের আসনে বসলে কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

বেসরকারি ব্যাঙ্কের কালো ইতিহাস মানুষ ভোলেনি। গত শতকে যখন তখন পাততাড়ি গুটিয়ে বেপাত্তা হয়ে

চারের পাতায় দেখুন

রায়গঞ্জে কৃষকদের দৃপ্ত মিছিল

দিল্লির কৃষক আন্দোলন সমাজে কৃষকদের একটি মর্যাদার স্থান তৈরি করে দিয়েছে। 'আমরা অন্নদাতা, আমাদের শ্রমেই মানুষের খাদ্য তৈরি হয়'—এই গর্ববোধ কৃষকদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে, অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করছে, চালিত করছে

দাবি আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনে। এই অধিকারবোধ নিয়েই সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ বিডিও-র কাছে দাবিপত্র পেশ করেছে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের রায়গঞ্জ ব্লক কমিটি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনা বা রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্প কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি এই ব্লকের শীতগ্রাম ও রামপুরের দ্বীপনগরে, আদিয়ারে। পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানদের বারবার বলেও কাজ হয়নি। ফলে কৃষকরা দাবিপত্রে গণস্বাক্ষর অভিযানের ডাক দেয়। পাকা রাস্তা নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, সমস্ত ফসলের এমএসপি-র ব্যবস্থা করা ও সারের কালোবাজারি রোধের দাবি জানানো হয় স্মারকপত্রে।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ব্লক কমিটির সহ সভাপতি ধীরেন বর্মন, সদস্য মাঝি হেমরম, বিশ্বনাথ বর্মন এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা উপদেষ্টা দুলাল রাজবংশী প্রমুখ।

সেভ এডুকেশন কমিটির কর্মশালা

ইউজিসি রেগুলেশন ২০২৫-এর মাধ্যমে শিক্ষায় ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী কেন্দ্রীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং শিক্ষার পঠন-পাঠনকে লঘু করার বিরুদ্ধে গত ২২ মার্চ সেভ এডুকেশন কমিটি, কলকাতা জেলার উদ্যোগে ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে অধ্যাপক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের এক কর্মশালা আয়োজিত হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি 'অ্যাপ্রোচ পেপার' প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়। তারপর প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, অধ্যাপক শান্তনু রায় এবং অধ্যাপক গৌতম মাইতি আলোচনা করেন। এরপর ২৯ ও ৩০ মার্চ শ্যামপুকুর, সোনারপুর দক্ষিণ, জোড়াসাঁকো, বেলেঘাটা এবং যাদবপুরে কনভেনশন ও আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

তিনের পাতার পর

যেত বেসরকারি ব্যাঙ্ক, পথে বসতেন গ্রাহকরা। ১৯১৩ থেকে ১৯৬৯-এ জাতীয়করণের আগে পর্যন্ত এ দেশে ২১৩২টি ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলেছিল। কর্মচারীরা যেমন কাজ হারিয়েছিলেন, তেমনি অগণিত গ্রাহক হয়েছিলেন সর্বস্বান্ত। ধনকুবেরদের স্বার্থ রক্ষা করতে সেই দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। আজও বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভয়াবহ। নানা দুর্নীতি এদের সঙ্গী। এখানেও অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা বেশি এবং কাজের স্থায়িত্বও প্রশ্নের সম্মুখীন। বেসরকারি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার কর্মীকে অন্যায়ভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে নিয়মকানুনও মানা হয়নি। এআইবিইইউএফ তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

দাবি উঠেছে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মীদের পেনশন, কর্মরত কর্মীদের দ্বিপাক্ষিক বেতন চুক্তির পরে পরেই আপডেট করতে হবে। সে দাবি পূরণ না করে সামান্য কিছু এক্সগ্রাসিয়া দিয়ে দায় সেরেছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ব্যাঙ্ক শিল্পেও নতুন পেনশন স্কিম হিসাবে এনপিএস বা ইউপিএস (ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম) চালু করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত শেয়ার-বাজার নির্ভর। ফলে অবসরপ্রাপ্তরা পেনশন আদৌ পাবেন কি না কিংবা পেলে কত পাবেন তা অনিশ্চিত। তাই দাবি উঠেছে সবার ক্ষেত্রে পুরানো পেনশন স্কিম ফিরে আসুক।

ব্যাঙ্ক কর্মীদের এই আন্দোলন দু'দিনের ধর্মঘট ডেকে কিছু আশ্বাসের ভিত্তিতে তা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে শেষ হতে পারে না। দাবি আদায় করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলনের রাস্তায় যেতে হবে। এ জন্য চাই ঐক্য। ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলনই পারে দাবি আদায় করতে। অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং স্বতন্ত্র জাতীয় সেক্টর ভিত্তিক ফেডারেশন তথা অ্যাসোসিয়েশনগুলি ২০ মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই ধর্মঘট সফল করার দায়িত্ব ব্যাঙ্ককর্মীদেরও নিতে হবে।

সরকারি উদাসীনতা চাপা দিতেই কি মাতৃত্বের মহিমাকীর্তন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'আমার বাংলা' বইতে জগদ্দলের পাট কলের শ্রমিক পার্বতীয়া-র কথা লিখেছিলেন। কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর জন্য পাঁচ মিনিটও ছুটি মিলত না কারখানায়, ছেলে কেঁদে মরে গেলেও কান্না থামানোর মতো কেউ ছিল না। তাই একরত্তি ছেলের মুখে আফিং গুঁজে দিয়ে কাজে যেত পার্বতীয়া। ছেলে কাঁদত না, ঘুমাত মড়ার মতো। দেশে তখন ব্রিটিশ শাসন। ২০২৫-এর স্বাধীন ভারতবর্ষে দিল্লির পুলিশ কনস্টেবল রিনার অবস্থা পার্বতীয়ার চেয়ে ভাল নিশ্চয়ই। ডিউটিতে আসার সময় এক বছরের ছেলেকে সাথে নিয়ে আসার সুযোগ অন্তত তাঁর হয়েছে। যে স্টেশনে আগের দিনই কুম্ভমেলার যাত্রীদের প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন আঠেরো জন, সেই স্টেশনে সারাদিন ধরে ভিড় সামলানো আর সুরক্ষার দেখভাল করার দায়িত্ব পালন করতে রিনা এসেছিলেন শিশুসন্তানকে বুকে বেঁধে। একজন মা এইভাবে প্রতিকূলতার সাথে লড়ে পুলিশের কর্তব্য পালন করছেন, পেশার দায়িত্ব এবং মায়ের ভূমিকা দুইই পালন করছেন কত দক্ষতার সাথে, এই মর্মে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে রিনার ছবি, ভিডিও। সম্ভবত মহাকুম্ভের সাথে যোগ থাকার কল্যাণেই রিনার এই কর্তব্য পালন আরও 'মহিমান্বিত' হয়ে উঠেছে বিজেপি শাসিত ভারতবর্ষে।

কিন্তু এ দৃশ্য কি সত্যিই গর্বের? নাকি লজ্জার? সে দিনের পাট-শ্রমিক পার্বতীয়ার সাথে আজকের পুলিশকর্মী রিনার মিল একটাই— তারা দু-জনেই নিরুপায় মা, যাঁদের সামনে সন্তানকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসে শান্ত, নিঃশঙ্ক মনে নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার কোনও পথ খোলা রাখেনি এই কঠিন সমাজব্যবস্থা। একজন মা স্বাভাবিক ভাবেই নিজের সব রকম শারীরিক অসুবিধা উপেক্ষা করে যন্ত্রণা সহ্য করেও সন্তানকে নিরাপদ, সুরক্ষিত রাখতে চান। কিন্তু যে সন্তান বড় হয়ে এই দেশের একজন নাগরিক হবে, অবদান রাখবে দেশ ও সমাজের গঠনে, যে মানুষকে 'মানবসম্পদ' বলে উল্লেখ করা হয়, অমিত সম্ভাবনাময় সেই প্রাণকে কী দৃষ্টিতে দেখছে আজকের সমাজ, আজকের রাষ্ট্র? চারপাশের ভুরি ভুরি উদাহরণ বলে দেবে, স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর পার করেও মায়েদের, শিশুদের সুস্থতা, সুরক্ষার ব্যবস্থা করাকে এই রাষ্ট্র নিজের কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলে মনে করে না। নানা বাধা এবং অসুবিধার উঁচু দেওয়াল পেরিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সন্তানকে বড় করাই আজও এ দেশের বিরাট সংখ্যক মায়ের জীবনের স্বাভাবিকতা। ঘটনাচক্রে রিনা একজন পুলিশকর্মী, যে পুলিশ রাষ্ট্রের পাহারাদার, সরাসরি নিযুক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে। অথচ রাষ্ট্রের দেখভালে নিযুক্ত এই মায়েদের চিন্তা দূর করার দায় কিন্তু রাষ্ট্র ছিটেফোঁটাও নেয়নি। রিনা বা রিনার মতো যে হাজার হাজার সাধারণ মহিলা পুলিশকর্মী মুখ বুজে নিজের কাজটুকু করে যাচ্ছেন, তাঁরা জেনেই গিয়েছেন, সন্তান পালনের দায় এবং দায়িত্ব সমস্তটাই একান্ত ভাবে তাঁদের। তাও রিনার একরত্তি সন্তান মায়ের বুকের কাছে লেপটে থাকার সুযোগটুকু পেয়েছে, সমাজের প্রান্তিক অংশের শিশুদের অবস্থা আরও ভয়ানক, আরও করুণ। যে মা ইটভাটায় কাজ করার সময় শিশুকে আগুনের আঁচের পাশেই বসিয়ে রাখতে বাধ্য হন, যে মা শিশুকে পিঠে বেঁধে সিমেন্টের পাত্র মাথায় ভারা বেয়ে ওঠেন, যে মা ফুটপাথের বিছানায় সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে সারা দিন ঘোরেন এক মুঠো ভাতের সন্ধানে, এদের কারও অবস্থা দেখেই মাতৃত্বের মহিমার কথা মনে আসে না, মনে ভিড় করে একরাশ অসহায় রাগ এবং লজ্জা। এর বাইরেও রইলেন তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারের উচ্চশিক্ষিত মায়েরা যাঁরা সন্তান প্রতিপালনের স্বার্থে নিজের পেশা, উপার্জন বা ভাল লাগার ক্ষেত্রটি থেকে সরে আসতে বা বছরের পর বছর সরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২২-২৩ সালের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের তথ্য বলছে, কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা পান সারা দেশের সমস্ত কর্মরত মহিলার মাত্র ৬.৫ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ০.১ শতাংশ, অর্থাৎ নেই বললেই চলে। এমনকি নিয়মিত বেতন পান, এমন মহিলাদের মধ্যেও মাত্র ৩২.৩ শতাংশ মাতৃত্বকালীন আইনকানুনের সুবিধা পেয়ে থাকেন। নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে, দশ জনের মধ্যে একজন মহিলা তাঁর কাজে যোগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে সন্তান প্রতিপালনের অসুবিধার কথা বলছেন। এই আবহে দাঁড়িয়ে ভারি নিষ্ঠুর শোনায় প্রধানমন্ত্রীর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান, যে প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের প্রায় আশি শতাংশ খরচ হয়েছে শুধু বিজ্ঞাপনের জৌলুসে। অন্য দিকে 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী' নিয়ে যতই ঢাক পেটানো হোক, এ রাজ্যে কন্যাদের সুস্থভাবে বাঁচার পরিবেশটুকুও যে দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, গত বছরের ৯ আগস্টে আর জি করের ঘটনার পর তা আর মানুষকে তথ্য দিয়ে দেখাতে হয় না।

বছরের পর বছর আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস চলে যায়। প্রতি বছরের মতোই মূল ধারার মিডিয়া শাড়ি-গয়না-প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে ঢেকে রাখতে চাইল প্রীতিলতা, রোকেয়া, সাবিত্রী ফুলে-র সংগ্রামী তেজকে, যাতে মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের সুস্থ জীবনের দাবি সত্যিকারের আলোর পথ চিনতে না পারে। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার করেও, নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতায় মেয়েদের উন্নতি নিয়ে এত প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি থাকা সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে

আটের পাতায় দেখুন

মানবপাচারের উর্বর জমি গুজরাটই নাকি উন্নয়নের ‘মডেল’ রাজ্য!

চোরাপথে কানাডা সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় ঢুকতে গিয়ে গুজরাটের ডিঙ্গুচা গ্রামের জগদীশ প্যাটেল, স্ত্রী বৈশালীবেন এবং তাঁদের এগারো ও তিন বছরের দুই সন্তান ঠাণ্ডায় জমে মারা গিয়েছিলেন ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে। শিকল ও হাতকড়া পরিয়ে যাঁদের এখন ভারতে ফেরত পাঠাচ্ছে আমেরিকা, সেই বেআইনি অভিবাসীদের দলে ভিড়ে জীবনটাকে একটু গুছিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এই নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে ইডি-র হাতে উঠে এসেছে এক বিস্ময়কর তথ্য। তারা জানাচ্ছে, ভারতে চোরাপথে মানুষ পাচারে যুক্ত চার থেকে সাড়ে চার হাজার এজেন্টের মধ্যে দু’হাজারই গুজরাটের বাসিন্দা। এরা কানাডার ভিতর দিয়ে আমেরিকায় বেআইনি ভাবে পাচার করে ভারতীয়দের। তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০২১ থেকে ’২৪-এর জুলাইয়ের মধ্যে কানাডার সহযোগী সংস্থাগুলির সঙ্গে ১২ হাজার বার লেনদেন করেছে এই এজেন্টরা। অর্থাৎ ১২ হাজার বার এক বা একাধিক মানুষের দলকে চোরাপথে আমেরিকায় পাঠানোর চেষ্টা করেছে তারা। আরও একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, শুধু ২০২৩ সালেই বেআইনি ভাবে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতের যে ৬৭ হাজার ৩৯১ জন মানুষ, তাঁদের মধ্যে শুধু গুজরাটেরই বাসিন্দা ছিলেন ৪১ হাজার ৩৩০ জন। অর্থাৎ আমেরিকায় বেআইনি ভাবে ঢুকতে চাওয়া মানুষের ৬১ শতাংশেরও বেশি গুজরাটের বাসিন্দা!

এই গুজরাটই না উন্নয়নের মডেল রাজ্য, যা নিয়ে বিপুল ঢাক পেটায় বিজেপি! তা হলে প্রতি বছর এত মানুষ একটু রুজি-রোজগারের খোঁজে ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চোরাপথে বিদেশে পাড়ি দেয় কেন? ‘ডবল ইঞ্জিন’ গুজরাটের এই ঢাক-পেটানো উন্নয়নের আসল চেহারা তা হলে কেমন? একটু খতিয়ে দেখা যাক বরং।

পরিসংখ্যানের ভাষায় গুজরাট কিন্তু সত্যিই ‘ধনী’ রাজ্য। কারণ, দেশের যে রাজ্যগুলি বার্ষিক আর্থিক বৃদ্ধির হারে এগিয়ে রয়েছে, গুজরাট তাদের অন্যতম। তা ছাড়া ২০২২-’২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী এই রাজ্যের মাথাপিছু উৎপাদনের মূল্য ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৬৩ টাকা— জাতীয় গড়ের দ্বিগুণেরও বেশি। এমন একটি রাজ্যের মানুষ তা হলে এত ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ-স্বজন ত্যাগ করে দলে দলে বেআইনি অভিবাসী হতে চাইছেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরও পরিসংখ্যান থেকেই পাওয়া যায়। এ কথা ঠিকই যে, দেশের বেশ কিছু বিপুল সম্পদশালী মানুষের বাস গুজরাটে, যাদের আকাশছোঁয়া আয়ের জোরে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির এমন উচ্চগতি। আর গড়ের অঙ্কের নিয়ম মেনে এদের দৌলতেই রাজ্যের মাথাপিছু গড় আয় জাতীয় গড়কে ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু বিপুল সম্পদের অধিকারী হাতে-গোনা এই মানুষগুলিকে বাদ দিলে রাজ্য জুড়ে রয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ যে সাধারণ মানুষ, পরিসংখ্যান থেকেই তাঁদের জীবনের দুর্দশাও স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, আর্থিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার গুজরাটে যথেষ্ট কম। শুধু তাই নয়, সে রাজ্যে চাকরি-বাকরির মানও অত্যন্ত নিচু। ২০২২-এর পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গুজরাটে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ৭৪ শতাংশের কাছেই চাকরির কোনও লিখিত চুক্তিপত্র নেই। এর মানে হল, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কাজ টিকে থাকার কোনও স্থিরতা নেই। মজুরির হারও গুজরাটে ভীষণ রকমের কম। ২০২৪-এর এপ্রিল-জুনের পরিসংখ্যান বলছে, অস্থায়ী শ্রমিকদের দৈনিক গড় মজুরি এ রাজ্যে মাত্র ৩৭৫ টাকা যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই কম। শুধু অস্থায়ী শ্রমিকরাই নন, গুজরাটে নিয়মিত বেতনের কর্মীদেরও বেহাল দশা। গত বছরের এপ্রিল-জুনের হিসাবে তাঁদের গড় মাসিক আয় সাড়ে ১৭ হাজার টাকার মতো এবং এ-ও জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই কম। সবচেয়ে দুর্গতির মধ্যে আছেন গুজরাটের কৃষি-শ্রমিক তথা খেতমজুররা। তাঁদের দৈনিক মজুরি মাত্র ২৪২ টাকা, ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন। স্বাভাবিক ভাবেই গুজরাটের গ্রাম-শহরের সাধারণ মানুষ মাসিক খরচের পরিমাণের দিক দিয়েও দেশের বেশিরভাগ রাজ্যের থেকে পিছিয়ে আছেন, খোদ সরকারি সংস্থা এনএসএসও-র পরিসংখ্যান জানাচ্ছে এই তথ্য। নানা সমীক্ষা থেকে এ কথাও বেরিয়ে আসছে যে, গুজরাটের ৩৮ শতাংশ মানুষেরই ভরপেট খাবার জোটে না। এই অবস্থায় সন্তান-সন্ততি, পরিজন বা বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জন্য দু’বেলা দু’মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে জীবন বাজি রেখে গুজরাটের দরিদ্র মানুষ যে চোরাপথে আমেরিকা পাড়ি দেওয়াটাকেই ভালো মনে করবেন, এতে বিস্ময়ের কী আছে!

চলমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কল্যাণে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তথাকথিত উন্নয়নের মডেল গুজরাটে সেই বৈষম্য এত বেশি প্রকট কেন— এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের এই রাজ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির সেবায় নিয়োজিত ক্ষমতাসীন বিজেপির সরকারি নীতির মধ্যে। ১৯৯৫ সাল থেকে গুজরাটে সরকারি ক্ষমতায় আছে বিজেপি। এর মধ্যে ২০০১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই মোদিজি স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো সামাজিক খাতগুলিতে সরকারি বরাদ্দ কমাতে শুরু করেন। বন্দর, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি ইত্যাদি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে যে সব প্রকল্প তাঁর সরকার হাতে নেয়, সেখানে ধীরে ধীরে শ্রমিকের প্রাধান্য কমিয়ে সেগুলিকে পুঁজি-নির্ভর করে তোলা হয়। বিজেপি সরকারে বসার আগে গুজরাটে যে শিল্পনীতি চালু ছিল, সেখানে খানিকটা গুরুত্ব পেত ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলি। ২০০৩ ও তার পরে ২০০৯-এ সে রাজ্যের নরেন্দ্র মোদি সরকার শিল্পনীতির চেহারা পাল্টে দেয়। বিধানসভায় পাশ করানো হয় ‘গুজরাট বিশেষ বিনিয়োগ অঞ্চল আইন’। রাজ্যকে ভারতের নানা রাজ্যের এবং বিশ্বের নানা দেশের বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণস্থল বানানোর লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ নেয় গুজরাট সরকার। শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন তৈরি করে বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে জমি তুলে দেওয়া শুরু হয়। তৈরি হতে থাকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসইজেড, যেখানে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার যে সব আইন দেশে আছে, সেগুলি কার্যকর নয়। যে সমস্ত কল-কারখানা সেই সময় তৈরি হয়, বাড়তি মুনাফার লক্ষ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলি পুঁজিনিবিড় করে গড়ে তোলা হয়। কল-কারখানা হলে কাজ জুটবে বলে স্বপ্ন দেখেছিলেন যাঁরা সেইসব শ্রমিক-কর্মচারীর কাজ পাওয়ার আশা শূন্যে মিলিয়ে যায়।

গুজরাটের নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই নতুন শিল্পনীতির কল্যাণে রাজ্য ও গোটা দেশের হাতে-গোনা কয়েকজন একচেটিয়া পুঁজির মালিক ব্যাপক ভাবে লাভবান হন। কিন্তু মালিকদের হাতে দেদার জমি তুলে দেওয়ার পরিণামে সেখানকার কৃষক সমাজের একটা বড় অংশ জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হন। মোট বার্ষিক উৎপাদন তথা আয়ের নিরিখে রাজ্যের বিপুল অগ্রগতি ঘটে, কিন্তু কাজ না পেয়ে বা কাজ হারিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এ দিকে বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ২০০৪ থেকে ২০১৪— এই দশ বছরে বন্ধ হয়ে যায় গুজরাটের ৬০ হাজার ছোট ও মাঝারি উৎপাদন সংস্থা। পথে বসেন অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী।

কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসে বিজেপি যেমন বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের অবাধ লুটের সুযোগ করে দিয়ে চলেছে, একই ভাবে তাদের ‘মডেল রাজ্য’ গুজরাটে তাদেরই ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকার উন্নয়নের যাবতীয় সুফল তুলে দিয়েছে শুধুমাত্র অতি অল্পসংখ্যক একচেটিয়া পুঁজিমালিকের হাতে। আর তাদের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বোঝা বয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হওয়ার পথে হাঁটছে গুজরাটের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-চাষি-সাধারণ মেহনতি মানুষ। কোনও রকমে প্রাণে বাঁচার, পরিজনদের বাঁচিয়ে রাখার উপায় খুঁজতে তাই দলে দলে তাঁদের পাড়ি দিতে হচ্ছে বিদেশ-বিভুঁইয়ে। বিপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গল পার হয়ে, ডিঙি নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছেন তাঁরা জীবনের খোঁজে। কেউ সফল হচ্ছেন, কারও জীবন পথেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার কাউকে হাতকড়া আর শিকল পরে আমেরিকা-সরকারের চাপিয়ে দেওয়া অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে জন্মভূমির মাটিতে, অনেক যন্ত্রণায় যে মাটি একদিন ছেড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। এটাই দেশের উন্নয়নের মডেল রাজ্যের আসল ছবি, প্রচারের ঢাক পিটিয়ে যা চেপে রাখতে চায় কেন্দ্র ও গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের কর্তারা।

(সূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ, ৪ মার্চ ’২৫ ও দ্য ওয়্যার, ১২ ফেব্রুয়ারি ’২৫)

ব্যাঙ্কে কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দিল্লিতে বিক্ষোভ

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে, দেশ জুড়ে বিভিন্ন শাখা থেকে হাজার হাজার কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (এআইবিইইউএফ) ও অল ইন্ডিয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক মেন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৭ মার্চ দিল্লির লোধী রোডে ব্যাঙ্কের জোনাল অফিসের সামনে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সমাবেশে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল বলেন, ছাঁটাই কর্মচারীদের অবিলম্বে ফিরিয়ে নেওয়া না হলে এই আন্দোলনকে আমরা দেশব্যাপী আরও শক্তিশালী করতে বাধ্য হব। প্রতিবাদ সভায় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রমেশ পরাশর, এআইবিইইউএফ-এর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস ছাড়াও ছাঁটাই কর্মীদের পক্ষে দিল্লির অভিনব রাই, মুম্বাইয়ের ধর্মেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবি

সম্প্রতি কয়েক দিনের আচমকা ঝড়, শিলাবৃষ্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কোলাঘাট ও পাঁশকুড়া, দাঁতন, বেলদা, খড়্গপুর প্রভৃতি ব্লক এলাকায় বোরো ধান, ফুল, সব্জি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে কৃষক সংগ্রাম পরিষদ।

পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, শুধু চাষের নয়, বেশ কিছু বাড়ির টালি ও অ্যাসবেস্টাসের চালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের অবিলম্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি কৃষি দপ্তরের কাছে জানিয়েছে সংগঠন।

বাঁকুড়ায় রেশন আন্দোলনে দাবি আদায়

বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের গোগড়া অঞ্চলের চাঁদড়া, নেৎকামলা, কর্কটা প্রমুখ গ্রামের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত শত শত রেশন গ্রাহক তিন মাস ধরে রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন না। ২২ মার্চ গ্রামগুলি থেকে গ্রাহকরা রেশন ডিলারের দোকানের সামনে অবরোধ বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দীপেন বাউরী।

বিক্ষোভ চলাকালীন ব্লকের খাদ্য দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে রেশন সমস্যার দ্রুত সমাধানের কথা বললে অবিলম্বে তা কার্যকর করার দাবিতে বিক্ষোভ চলতে থাকে। অবশেষে ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার নিজে এসে সবাইকে দু-মাসের বকেয়া রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আরও এক মাসের বকেয়া রেশন মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন।

পাঠকের মতামত

বিজেপির ‘জিরো টলারেন্স’ সমালোচকদের প্রতিই

মহাকুম্ভ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের ফোলানো-ফাঁপানো প্রচারের শেষ নেই। কিন্তু যে ঘটনা তারা চেপে যেতে চাইছে, ওই উত্তরপ্রদেশেই এবার হিন্দি দৈনিকের জনপ্রিয় তরুণ সাংবাদিকের খুনে কার্যত দিশাহীন সরকার। প্রশ্ন উঠছে বিজেপি নেতাদের ঘোষিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে।

বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশে একের পর এক খুন, ধর্ষণকাণ্ডে জড়িতদের কোনও শাস্তি হয়নি। বেশ কিছু বিধায়ক ও সাংসদ খুন-ধর্ষণের আসামী! ধর্ষণ-খুনের অপরাধীরা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বিজেপি, আরএসএসের লোকজন ফুলের মালা দিয়ে তাদের বরণ করে ঘরে তুলেছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র বেনারসেও তা ঘটেছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হয় কথায়-নয় কথায় আক্রমণ ও মারধর করছে। পানীয় জল নিয়ে স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত জাত-পাত বিভেদের রাজনীতির বলি হচ্ছে। এইসব ঘটনার প্রকাশ্য ভিডিও ফুটেজ দেখে শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশবাসী আতঙ্কিত। সেই উত্তরপ্রদেশে সীতাপুরে কয়েকদিন আগে এক জনপ্রিয় হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিক দুর্নীতির মৌচাকে শুধু একটা ঢিল ছুঁড়েছিলেন! খবর করেছিলেন গোটা রাজ্য জুড়ে ধান কেনা ও জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি নিয়ে সরকারি স্তরে লাগামছাড়া দুর্নীতির বিষয়ে। মাসখানেক ধরে জনৈক সাংবাদিকের দুর্নীতি বিষয়ক ধারাবাহিক খবর বিব্রত করেছিল উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারকে।

প্রশ্ন উঠছে সে জন্যই কি সীতাপুরের এই তরুণ সাংবাদিককে ভরদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হল? দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ এখনও পর্যন্ত কারও নাকি নাগাল পায়নি পুলিশ!

গণবিক্ষোভকে ধামাচাপা দিতে চারজন অধস্তন পুলিশকর্মীকে বরখাস্ত করেই দায় সেরেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। ওই রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, হাথরসে দলিত তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার বিষয়ে খবর করতে যাওয়ার অপরাধে কেরালার সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানকে বিনা বিচারে দু’বছর ধরে জেলে থাকতে হয়েছে। ব্যাপক শিশুমৃত্যু ঠেকাতে নিজস্ব উদ্যোগে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে শিশুদের প্রাণ বাঁচানোর অপরাধে সরকারি হাসপাতালের শিশু চিকিৎসক কাফিল খানকে ৭ মাস জেল খাটতে হয়েছে বিজেপির রাজত্বে।

দু’দশক আগে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সীমান্তে এনএইচএআই প্রকল্পের চূড়ান্ত আর্থিক দুর্নীতি ও চুক্তিগত অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে চিঠি লেখার অপরাধে ওই প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দুবে খুন হয়েছিলেন গোয়ার কাছে একটি হোটেলের রাস্তায়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুবের পরিবার আজও বিচার পায়নি। একইভাবে পশ্চিমবাংলাতেও তৃণমূলের রাজত্বে খুন-ধর্ষণ-দুর্নীতি-রাহাজানি বেড়েই চলেছে, যা নিয়ে সংবাদপত্রে ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিজেপি নেতারা আস্ফালন করছেন। প্রতিনিয়ত দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। ডবল ইঞ্জিন সরকার হলেই নাকি দুর্নীতির শিকড় সমূলে উৎপাটিত করে সোনার বাংলা গড়ে তুলে সব সমস্যার সমাধান করবেন তাঁরা! তা হলে উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো তথাকথিত হিন্দু ভোটে জিতে আসা পশ্চিমবাংলার বিজেপি জনপ্রতিনিধিরা সাংবাদিক রাঘবেন্দ্র বাজপেয়ীর মৃত্যু নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন কেন? ধর্ম-পরিচয়ে তিনি তো হিন্দু! এ থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমতায় থাকলে যথেচ্ছ খুন-ধর্ষণ করা যাবে, আর বিরোধী দলে অবস্থান করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে নাটক চলতে থাকবে! আসলে বিজেপির হিন্দু-প্রেম স্রেফ ক্ষমতা দখলের জন্য। আশার কথা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভোটলোভী এইসব দলের প্রতারণা, দেরিতে হলেও মানুষ ধরতে পারছে।

স্বপন জানা
মেচেদা

পুলিশ হয়েও মেয়েকে রক্ষা করতে পারব তো!

আজ আমি সকলের সাথে আমার একটা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাই। একদিন আমি কাজ থেকে ফেরার সময় এক পুলিশকর্মী আমার বাইক থামিয়ে তাঁকে একটু শিয়ালদায় নামিয়ে দিতে বলেন। আমি গাড়ি থামিয়ে ওনাকে তুলে নেওয়ার পর দু’জনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে। কিছু কথাবার্তার পর ওনাকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা আর জি কর-এর ঘটনা সম্পর্কে আপনার কী মত? উনি উত্তরে যা বললেন, তা আমি আশা করিনি। আমি ভেবেছিলাম এই প্রশ্নে উনি হয়তো রাগ করবেন। কিন্তু ঘটল ঠিক তার বিপরীত।

উনি বললেন, এই আন্দোলনকে বাধা দিয়ে আমি যে পাপ করেছি, সেই পাপ আমাকেও হয়তো ছাড়বে না। বললেন, আমার এক ভাইঝি ডাক্তার হয়েছে। আমার মেয়েও ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বললেন, সমাজে এত বড় একটা অন্যায় ঘটনা ঘটে গেল অথচ আসল দোষীরা সাজা পেল না। এখন সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত— কারওর ঘরের মহিলাদেরই কোনও নিরাপত্তা নেই। আমি নিজে পুলিশে কাজ করি, তা সত্ত্বেও নিজের মেয়েকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হয়। সেও তো বড় হচ্ছে! তাকে কি আমি নিরাপত্তা দিতে পারব? জানি না কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তার জন্য! এই চিন্তায় আমার রাতের পর রাত ঘুম হয় না। গভীর উদ্বেগ ঝরে পড়ে তাঁর কথায়।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি ঘটনার কথা বললেন। আর জি কর-এর ঘটনার ন্যায়বিচার চেয়ে যখন আন্দোলন তুঙ্গে সেই সময়ে একদিন ওনার মায়ের বয়সী এক মহিলা মিছিল থেকে বেরিয়ে এসে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— বাবা, তুমি কি আমাকে অ্যারেস্ট করবে? পুলিশকর্মীটি বললেন, “ওনার কথা শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। কোনও উত্তর দিতে পারিনি। আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। পেছনে আই জি সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না। মাথাটা নিচু হয়ে গিয়েছিল আমার।”

অরিজিৎ চ্যাটার্জী
কলকাতা-১২

কেন্দ্রীয় কৃষিপণ্য বিপণন নীতি শুধু কৃষক নয়, সমস্ত অংশের মানুষকে নিঃস্ব করবে

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর যে কৃষিপণ্য বিপণন নীতির খসড়া প্রকাশ করেছে, তাতে কৃষক কল্যাণের ছিটেফোঁটাও নেই। এই নীতিতে কৃষক কল্যাণের মন্ত্র জপতে জপতেই কৃষককে বৃহৎ পুঁজির গ্রাসে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন এ আই কে কে এম এস সহ ৫০০টি কৃষক সংগঠনের সংগ্রামী জোট সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এস কে এম) এই বিপণন নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-ও এর বিরুদ্ধে পথে নেমেছে। ২১ জানুয়ারি লেনিন স্মরণ দিবসে কলকাতায় এই দলের ডাকা মহামিছিলেও এই কৃষি বিপণন নীতির বিরুদ্ধে গর্জন উঠেছে। ৩ এপ্রিল এই দলের ডাকা আইন অমান্য আন্দোলনেও এটি অন্যতম ইস্যু।

ঠিক কী কারণে এই নীতি বিপজ্জনক? এই নীতিতে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের পাইকারি বাজার খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর ফল কী হবে? এর ফলে সমস্ত কৃষিপণ্য চলে যাবে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের নিয়ন্ত্রণে। তারা সর্বোচ্চ মুনাফা করতে দ্বিমুখী নীতি নেবে। একদিকে কৃষকদের কাছ থেকে একেবারে কম দামে ফসল কিনবে। আর জনসাধারণের কাছে তা বিক্রি করবে অত্যন্ত চড়া দামে। কৃষক এর ফলে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে। জমিজমা বিক্রি করে মজুরে পরিণত হবে। অন্যান্য অংশের জনগণও মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত হবে।

এই বিপণন নীতির দ্বিতীয় আপত্তিকর বিষয় হল চুক্তি চাষ। ফসল কেনাবেচা নিয়ে চুক্তি হবে বহুজাতিক কোম্পানি এবং কৃষকদের মধ্যে। এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই, কৃষিপণ্যের ক্রেতা বৃহৎ পুঁজিপতিরা দয়া করে কৃষকদের ন্যায্য দাম দেবে। সর্বোচ্চ মুনাফা-লোভীদের কাছে এমন মহানুভবতা আশা করা বৃথা। তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম মেনে ব্যবসায় নেমেছেন। ফলে এই নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ মুনাফা তুলতে চুক্তিকে নানাভাবে তারা প্রভাবিত করবে। নানা বাহানা তুলে, ফসলের গুণমানের অজুহাত তুলে এরা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করলেও গরিব কৃষকদের পক্ষে কিছু করার উপায় থাকবে না। বর্তমান অবস্থায় ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষক ঠকছেন ফড়েদের কাছে। চুক্তি চাষে তাঁরা ঠকবেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে। ফলে বঞ্চনা কমার অবকাশ নেই। বরং রয়েছে অত্যন্ত ক্ষমতাধর বৃহৎ পুঁজির গ্রাসে পড়ার আশঙ্কা।

কৃষি বিপণন নীতির তৃতীয় আপত্তিকর বিষয়টি হল, গ্রামীণ হাটগুলি চলে যাবে বহুজাতিক পুঁজির দখলে। বর্তমান ভারতে এপিএমসি (এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট কমিটি) আইনের অধীনে ৭০৫৭টি সংগঠিত পাইকারি বাজার আছে, অনিয়ন্ত্রিত বাজার আছে ৫০০টি এবং গ্রামীণ হাট আছে ২৯,৯৩১টি। গ্রামীণ হাটগুলি এখন নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামীণ পুঁজিপতিরা। এগুলির নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে বৃহৎ পুঁজির দখলে। এতে ক্ষুদ্র পুঁজি বিপন্ন হবে। এমনিতেই খুচরো ব্যবসা বিপন্ন হচ্ছে বৃহৎ পুঁজির দাপটে। বৃহৎ পুঁজির মালিকরা পুঁজির জোরে সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায় নেমেছে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না ক্ষুদ্র পুঁজি। তারা হটে যাচ্ছে। এভাবে বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া ব্যবসা কায়েম হলে তারা অত্যন্ত চড়া হারে দাম বাড়াবে। মানুষের জীবন আরও অসহনীয় হয়ে উঠবে।

কৃষি বিপণন নীতির চতুর্থ আপত্তিকর বিষয়টি হল এমএসপির বিলোপ। বর্তমানে ২৩টি কৃষিপণ্যে যতটুকু এমএসপি দেওয়া হয়, তার মধ্যে রয়েছে ৭ ধরনের দানাশস্য, ৫ ধরনের ডাল, ৭ ধরনের তৈলবীজ এবং ৪ ধরনের বাণিজ্যিক ফসল। কৃষি ব্যবসায়ীরা বাজারে দাম কমিয়ে দিয়ে কৃষককে যেভাবে ঠকিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে এমএসপি একটা রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করত। নতুন কৃষি বিপণন নীতিতে এমএসপি বিষয়ে একটি কথাও নেই। এর ফলে কৃষকদের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া, জমি হারানোর প্রক্রিয়া আরও তীব্রতর হবে।

নরেন্দ্র মোদি সরকার এই নীতির রূপরেখা তৈরি করলেও এর মূল উদগাতা কংগ্রেসের মনমোহন সিং। ১৯৯১ সালে বিশ্বায়ন-উদারিকরণের নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস এই ধারণা নিয়ে আসে। কংগ্রেস সরকার এপিএমসি আইন পাল্টে বৃহৎ পুঁজির হাতে কৃষিপণ্য কেনার আইনি অধিকার দেয়, চুক্তি চাষ আইনসিদ্ধ করে। এইভাবে কৃষিতে একচেটিয়া পুঁজির কর্তৃত্ব কায়েম করার পথ প্রশস্ত করে দেয় কংগ্রেস। বিজেপি সেই পথেই চলছে।

কংগ্রেস বা বিজেপি— দুটি দলই ভারতের বিভিন্ন একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার দল। কৃষিতে এদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের উদ্দেশ্যে এই ভয়ঙ্কর নীতি চালু করতে চাইছে মোদি সরকার। এর মধ্য দিয়ে ঘুরপথে, ভিন্ন নামের আড়ালে চূড়ান্ত জনবিরোধী, কৃষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কেন্দ্রীয় কৃষিনীতি ফিরিয়ে আনার কৌশল নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এআইকেকেএমএস গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের ১৭টি রাজ্যের রাজধানী শহরে এর বিরুদ্ধে কৃষক সমাবেশ করেছে। একে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে কৃষক কমিটি গঠনের চেষ্টা চলছে। ৩ এপ্রিল জেলায় জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে নিবিড় প্রচার চলেছে, তার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই কমিটিগুলির ভিত্তি।

রামনবমী ঃ ভোটই মুখ্য

একের পাতার পর

গভীর উদ্বেগ-আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে।

রামের প্রতি শ্রদ্ধা নয়, রামনবমীতে পেশির জোর দেখানোই উদ্দেশ্য

বিজেপির শীর্ষ নেতারা এ রাজ্যে এসে বারে বারে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের ভারতবিজয় সম্পূর্ণ হবে না বাংলার ক্ষমতা দখল না করতে পারলে। প্রতিটি নির্বাচনে তাঁরা তার জন্য কোনও প্রচেষ্টাকেই বাদ রাখেননি। কিন্তু তাঁরা মানুষের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, এই দলটির রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। দলটি আপাদমস্তক শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দল। তাই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে দলটির কোনও কর্মসূচি নেই। বরং তাঁরা সাবধানে এমন সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে চলেন। আর জি কর আন্দোলনে যখন সারা রাজ্য উত্তাল, সব স্তরের সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে সামিল তখনও যে এই দলটি সেই আন্দোলন থেকে পুরোপুরি সরে থাকল, তা দলটির জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্রের কারণেই। অথচ ভোটবাক্স তো ভরাতে হবে। তা হলে উপায়? উপায় একটিই। ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরি করো। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করো। ধুয়ো তোলো যে, হিন্দুরা এ দেশে বিপন্ন। তারা যে অজস্র সমস্যায় জর্জরিত— তার জন্য মুসলমানদের দায়ী করে কাঠগড়ায় তোলো।

এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের স্বাভাবিক রাস্তাটি বিজেপির সামনে আজ খোলা নেই বলেই কেবল বিদ্বেষ-বিভাজন তৈরির রাস্তাটিই এখন এ রাজ্যে তাদের একমাত্র দলীয় কর্মসূচি। তাই রাজ্যে তাঁদের রামনবমী উদযাপন রামের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা থেকে নয়। বিভাজন তৈরি করে, সমাজজুড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, মানুষের প্রাণের বিনিময়ে হলেও, ধর্মের ভিত্তিতে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে ক্ষমতায় পৌঁছনোর উদ্দেশ্যেই। তাই রামায়ণের মতো মহাকাব্যের শিক্ষাকে তুলে ধরার চেষ্টা এই রামনবমী পালনের কর্মসূচিতে নেই। বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে ধারা তা উত্তর ভারতের রামায়ণের ধারা থেকে কিছুটা আলাদা। এখানে রামায়ণের চরিত্রগুলিকে দেবতার রূপ দেওয়ার বদলে ঘরের ছেলেমেয়ের রূপ দিয়েছেন কবি-কথাকাররা। কিন্তু তাতে তো বিজেপির চলে না। বিজেপিকে পেশি-আস্ফালন দেখাতে হবে। তাই বাংলার ঐতিহ্য ভেঙে তাদের রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়। কপালে গেরুয়া ফেট্টি বেঁধে বাইক বাহিনীকে নামাতে হয়। রামের বিশাল কাটআউটে আলোর ঝলকানি লাগিয়ে, উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে মানুষকে চমকে দেওয়ার দরকার হয়। তাই মিছিলের রাস্তা বেছে বেছে সংখ্যালঘু এলাকাগুলির মধ্যে দিয়েই করে নিতে হয়। গত কয়েক বছরে রামনবমীর এমন প্রায় প্রতিটি মিছিল থেকেই সংখ্যালঘু এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়েছে। এ বারও বিজেপি নেতাদের মুখে যে লাগাতার আস্ফালন শোনা যাচ্ছে, তাতে দাঙ্গার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বামপন্থার চর্চার অভাবের সুযোগ নিচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে হিন্দু মহাসভা বাংলায় হিন্দুত্ব প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতো নেতাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ আটকে দিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের মতো নামকরা নেতাও বাংলার রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতার রঙে রাঙাতে পারেননি। তা হলে নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই বাংলায় বিজেপি আজ এ ভাবে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতার রাস্তায় হাঁটতে পারছে কী করে?

পারছে এই কারণে যে, নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সমাজজুড়ে যে যুক্তি, বুদ্ধির চর্চা হয়েছে, জ্ঞানের চর্চা হয়েছে, জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বার্থে লড়াইয়ের মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সিপিএম শাসনে তা প্রায় থিতিয়ে যায়। বামপন্থা এবং গণআন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করে পুঁজিপতি শ্রেণিকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি চলতে থাকে। বামপন্থী গণআন্দোলনকে তারা লাঠি-গুলি চালিয়ে দমনের রাস্তা নেয়। নীতিহীনতা, গায়ের জোর, অন্ধতা, সুবিধাবাদ রাজনীতিতে জেঁকে বসে। বামপন্থা সম্পর্কে এক অংশ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এর সুযোগ নেয় দক্ষিণপন্থী রাজনীতি। গত শতকের ষাটের দশকে এ রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট শাসনে যখন বড় দল হিসাবে সিপিএম শরিক দলগুলির উপর সংখ্যাগুরু দলীয় আধিপত্য চাপিয়ে দিতে থাকে তখনই এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বামপন্থীদের এমন আচরণ সম্পর্কে সাবধান করে বলেছিলেন— 'বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওৎ পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে।' বাস্তবে সেই সুযোগটাই আজ বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা হারানোর পরও সিপিএম নেতারা যে ভাবে 'আগে রাম পরে বাম' স্লোগান তুলেছিলেন, তাতে তাদের দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা দলে দলে বিজেপিকে সমর্থন করে রাজ্যের রাজনীতিতে বিজেপিকে জায়গা করে দিয়েছিল।

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস

সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির জমি তৈরি করে দিতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকাটিও কম নয়। সেকুলার ছদ্মবেশে তারাও বিজেপির সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কখনও তা নরম হিন্দুত্বের রাস্তায় হেঁটেছে, কখনও সংখ্যালঘুর ত্রাতা সেজে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারের সুবিধা করে দিয়েছে। অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনের সমস্যাগুলির সত্যিকারের সমাধান তাতে কিছুই হয়নি। বিগত বছরগুলিতে দেখা গেছে তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপির সঙ্গে অস্ত্র হাতে মিছিলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কখনও প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে দাঙ্গা চলতে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এক দিকে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করছে, আবার অন্য দিকে জনসমক্ষে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মতো আচরণ করছে। এ সবই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে।

ভোটসর্বস্ব এই দলগুলির রাজনীতির প্রধান উপাদান সাম্প্রদায়িকতা বলেই এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদ তাদের উপর অজস্র ধারায় ঝরে পড়ে। দলগুলির পিছনে শত-সহস্র কোটি টাকা ঢালতে তাদের একবারও ভাবতে হয় না। কারণ ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের উপর শোষণ, বঞ্চনা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, অশিক্ষার মতো সমস্ত রকম দুর্দশার জন্য যে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথা পুঁজিপতি শ্রেণিই দায়ী— সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই এর ফলে আড়ালে চলে যায়। শোষিত মানুষ নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে এবং একের দুর্দশার জন্য অপরকে দায়ী করে। এই সুযোগে পুঁজিপতি শ্রেণি নিশ্চিন্তে তাদের শোষণের স্টিম রোলার চালিয়ে যেতে পারে।

জনজীবনের মূল সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনই বাঁচার একমাত্র রাস্তা

এই অবস্থায় সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ অংশ, উদারবাদী অংশ এবং অবশ্যই যথার্থ বামপন্থীদের উপরই এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিরোধের গুরু দায়িত্বটি এসে পড়ে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের নিরলস কার্যক্রমই সমাজে সম্প্রীতি রক্ষার প্রধান গ্যারান্টি। তাই সমাজ জুড়ে যুক্তি-বুদ্ধি-ইতিহাস চর্চাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব স্তরের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সকলেই জানেন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজই চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে রুখতে তার পাশে দাঁড়াতে হবে, শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, শোষিত মানুষের মুক্তির রাস্তায় গুরুত্বপূর্ণ বাধা সাম্প্রদায়িক বিভাজন। শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের ঐক্য, যা তার সবচেয়ে বড় শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা সেই ঐক্যকেই বিঘ্নিত করে। বাঁচার দাবিতে লড়াই পিছিয়ে যায়। আর শুধু শোষিত মানুষের বাঁচার লড়াইকেই সাম্প্রদায়িকতা ক্ষতিগ্রস্ত করে তাই নয়, বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞানের চর্চা, বিজ্ঞানের চর্চা— সমস্ত কিছুকে পিছিয়ে দেয়। ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে দেয়। এমনকি মানবিক মূল্যবোধকে এবং স্নেহ মমতা ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলিকেও ধ্বংস করে দেয়। আমাদের সামনে এর বড় উদাহরণ হিসাবে রয়েছে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির ফ্যাসিবাদী রাজনীতি। যে জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চিন্তায় ভাবনায় জ্ঞানে শিল্পে ছিল ইউরোপের এক অত্যন্ত উন্নত দেশ, সেই জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান জাতীয়তাবাদের বিষ গোটা জার্মান জাতিকে এমন করে উন্মাদ করে তুলেছিল যে, সে দেশের শ্রমিকরা পর্যন্ত হিটলারের বিরোধিতা করতে, নাৎসীবাদের বিরোধিতা করতে ভুলে গেল। বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশও নাৎসীবাদীদের সঙ্গে গলা মেলাল। তার কী বীভৎস পরিণতি হয়েছে তা আজ সকলের জানা। তাই বিজেপি-আরএসএসের এই ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাত থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সম্প্রীতি-ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে এই রাজনীতির বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সদস্য কমরেড ফিরোজা আহমেদ (শেফালী) দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০ মার্চ শহরের দেবীবাড়ি পার্টি সেন্টারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

তিনি ১৯৭৯ সালে দলের কোচবিহার জেলা কমিটির প্রথম সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত কমরেড সুব্রত চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। পারিবারিক বাধাকে অতিক্রম করে দলের নির্দেশে দিনহাটা শহরে মামার বাড়িতে থেকে ছাত্র-যুব-মহিলা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গণআন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন, পরিচারিকাদের নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কারাবরণও করেন। বিগত সরকারের আমলে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি বার বার সিপিএমের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের ঠিক আগে ১৯৮৭ সালে দিনহাটায় দলের প্রথম লোকাল কমিটি গঠিত হলে তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। আর্থিক সংকট ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও দিনহাটা মহকুমার গ্রামগঞ্জে দলের বিস্তার ঘটান। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, যা দলীয় কর্মীদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নিজের উন্নত চরিত্রের দ্বারা তিনি ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক সহ সব স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করেছেন। তিনি বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি আজীবন সমস্ত রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সংগ্রাম করেছেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর পূর্বতন সদস্য প্রয়াত কমরেড আশীষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে দেবীবাড়ি পার্টি সেন্টারে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। এখানে কোচবিহার শহর লোকাল কমিটিতে যুক্ত হয়ে দলের কাজ করতে থাকেন। তিনি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। রাজ্য জুড়ে পরিচারিকাদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হলে তিনি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় 'সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি' গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং এই সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন পরিচারিকাদের আপনজন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময়ে দলের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

সৎ, নির্ভীক, সাহসী কমরেড ফিরোজা আহমেদের প্রয়াণে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল। ৮ এপ্রিল তাঁর স্মরণসভা কোচবিহার শহরে।

কমরেড ফিরোজা আহমেদ লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 34 Bengali Weekly April 4, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

কাকদ্বীপে দলের অফিস উদ্বোধন

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এসইউসিআই(সি)-র কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল কাকদ্বীপ শহরে। দলের প্রবীণ সংগঠক প্রয়াত কমরেড সুধীর বেতালের দান করে যাওয়া বাড়ি এবং জমির ওপর দলের কর্মী-সংগঠকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জনসাধারণের দু'হাত ভরা অর্থসাহায্যের ভিত্তিতে তা নব রূপ পেল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সুধীর বেতাল স্মৃতি ভবন ফলকের আবরণ উন্মোচন ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের রাজ্য সম্পাদক, পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও কমরেড সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার আলী লস্কর, কমরেড জীবন দাস ও অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক হাজির হয়েছিলেন প্রিয় দলের কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য অফিসের প্রয়োজনীয়তা ও কমরেডদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে পাথেয় করে মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে এই অফিস এবং কর্মী-সমর্থক সহ সকল জনগণ যাতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন, তিনি তার আবেদন রাখেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

মাতৃত্বের মহিমাকীর্তন

চারের পাতার পর

মন্ত্রীদের বক্তৃতায় মেয়েদের উন্নতি নিয়ে এত প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি থাকা সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে মেয়েদের এই অনন্ত দুর্দশা কেন? এর কারণ শুধু পুরুষতন্ত্রকে দোষারোপ করে বোঝা যাবে না। এ কথা ঠিক, সন্তান ও সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এবং সেখানে পান থেকে চুন খসলেই অশেষ শারীরিক, মানসিক লাঞ্ছনা বহু যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্দিষ্ট করে রেখেছে মেয়েদের জন্য।

কিন্তু আজ বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যে সমাজ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের ওপর শোষণ অত্যাচার চালাচ্ছে, তাকে সমস্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, সেই সমাজই পুরুষতন্ত্র এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে জিইয়ে রাখছে নিজের স্বার্থে। বহু ঘাম-রক্ত-লড়াইয়ের বিনিময়ে অর্জিত মেয়েদের ন্যায্য অধিকারগুলো ক্রমশ সঙ্কুচিত, পদদলিত হচ্ছে। আজ স্মরণ করা দরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা, যেখানে শ্রমিক শ্রেণির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নারীমুক্তির এক বিরাট দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। সেখানে মা এবং শিশুসন্তান রাষ্ট্রের চোখে বোঝা ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ। সেই সমাজে একদিকে যেমন যৌন নির্যাতন, পতিতাবৃত্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অন্য দিকে মেয়েদের সমবেতন, সমমর্যাদা, গর্ভবতী মা এবং শিশুসন্তানের যত্নের সমস্ত ব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্বে সুনিশ্চিত ছিল।

পুলিশ কনস্টেবল রিনা বা তাঁর মতো আরও লক্ষ লক্ষ মাকে যদি সত্যিই এক সুস্থ, মর্যাদার জীবন দিতে হয়, শুধু মা হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে মেয়েদের মুক্ত আকাশে শ্বাস নিতে হয়, এই পচে যাওয়া সমাজ সে মুক্তি দিতে পারবে না। এ দেশের বুকেও নতুন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্নটাকে রূপ দিতে হবে। সেই সুমহান কাজকে মাতৃত্বের কর্তব্যের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে এ যুগের মায়েদের।

ভেজাল ওষুধের রমরমা

একের পাতার পর

এবং ভবিষ্যতে যাতে রোগীদের উপর এমন নিষ্ঠুর আক্রমণ না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। পাশাপাশি জনসাধারণকে এই দাবি সহ জীবন-জীবিকার অন্যান্য দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

গণতন্ত্র রক্ষায় নেপালের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পাশে দাঁড়ান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩০ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, নেপালের জনগণ, বিশেষত হাজার হাজার ছাত্র, যুবক, মহিলা দীর্ঘকাল লড়াই করে প্রাণ দিয়ে স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্প্রতি জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে সে দেশের শাসক বামগোষ্ঠীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ভারতীয় দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির মদতপুষ্ট হয়ে সেখানকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসিস্ট শক্তি পুনরায় রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে নেপালের জনগণ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে।

নেপালের জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সকল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের সমর্থন করা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই যে, মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের এই যুগে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে জনগণের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। এই কারণেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

নেপালে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য আমরা নেপালের জনগণের এই সংগ্রামের প্রতি ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকেও নেপালের জনগণের গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সাংসদরা প্রকৃত জনপ্রতিনিধি হলে নিজেদের বেতন বৃদ্ধির জন্য এত নির্লজ্জ হতেন না

সাংসদদের বেতন এবং পেনশন নতুন করে ২৪ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এই বেতন বৃদ্ধি ২০২৩-এর ১ এপ্রিল থেকে কার্যকরী হবে। ফলে লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে ৭৮৮ জন সাংসদের জন্য বছরে খরচ হবে ৩৪০০ কোটি টাকা। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ মার্চ এক বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা করেন।

তিনি বলেন, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে দেশের খেটে খাওয়া মানুষ দিনে দিনে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। জীবনধারণের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের তুলনায় বেশিরভাগ শ্রমিক-কর্মচারীর আয় ক্রমাগত কমতে থাকায় তাদের দুর্দশা বেড়ে চলেছে। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বরাদ্দ দিনের পর দিন কমছে। এই পরিস্থিতিতে সাংসদদের এই বিপুল বেতন বৃদ্ধি নিতান্ত কুৎসিত। সাংসদদের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার কথা। কিন্তু তাঁরা বাড়তি সুবিধা আত্মসাৎ করতে এবং জনগণের পয়সায় নিজেদের আরাম আয়েসের ব্যবস্থাপনাতেই ব্যস্ত। জনপ্রতিনিধি হলে জনগণই তাঁদের দেখভাল করত, কিন্তু এই সাংসদরা জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি কোষাগার ভেঙে নিজেদের পকেট মোটা করার কাজে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, জনপ্রতিনিধিদের অন্যায় এবং অনৈতিক বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি মাত্র কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়েছিল ২০০৯ থেকে ২০১৪-র সংসদে। সেই কণ্ঠস্বর ছিল এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের। বছর বছর সাংসদদের বিপুল বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের পুরোপুরি ভাবে সরকার ও শাসক শ্রেণির লেজুড়ে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সরকারের এই মতলব জনগণকে বুঝতে হবে।

আসামে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের চাপে আসামে ১ এপ্রিল থেকে বিদ্যুতের মাশুল হ্রাস করার কথা ঘোষণা করেছে আসাম ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন। জীবনধারা (বিপিএল), গৃহস্থ এ এবং বি শ্রেণির গ্রাহকদের প্রতি ইউনিটে এক টাকা এবং বাকি সমস্ত শ্রেণির গ্রাহকদের প্রতি ইউনিটে পঁচিশ পয়সা মাশুল কমেছে। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, প্রিপেড স্মার্ট মিটার এবং টাইম অফ ডে (টিওডি) বিল পদ্ধতি প্রবর্তন করার বিরুদ্ধে লাগাতার লড়ে যাচ্ছে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। মাশুল হ্রাস করা ছাড়াও রেগুলেটরি কমিশন ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণের নির্দেশিকায় টিওডিকে অপশনাল রেখেছে।

উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরে সরকারি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লাভ করেছে ৩৭৫ কোটি টাকা। ফলে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন দাবি তুলেছিল লাভের এই টাকা গ্রাহকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। সেই দাবিই কিছুটা হলেও মান্যতা পেল।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com